Bengali Hons.
1st year, 2nd sem
Course - 201 BNGH C-3
Material by Rahul Panda

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

সংক্ষিপ্ত জীবনী

- ১৮২৮ সালে কলকাতা আগমন। পরের বছরে সংস্কৃত কলেজে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। সহপাঠী ছিলেন মদনমোহন তর্কালংকার।
- ১৮৩৯ সালে হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন।
- ১৮৪১ সালে মাত্রই ২১ বছর বয়সে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের হেড পণ্ডিত হিসেবে যোগ দেন। ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত সেই পদেই বহাল ছিলেন।
- ১৮৪৬ সালের এপ্রিল মাসে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন, কিন্তু কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে সেক্রেটারি রসময় দত্তের সঙ্গে মতান্তরের কারণে পরের বছর চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন।
- ১৮৫১ সালে পুনরায় সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষরূপে যোগ দেন, এবার পূর্ণক্ষমতাসহ।
- ১৮৫৫ সাল নাগাদ বিধবাবিবাহ বিষয়ক দুটি পুস্তক প্রকাশ করেন বিদ্যাসাগর, যথাক্রমে জানুয়ারি এবং অক্টোবর মাসে। পরের বছর জুলাই মাসে বিধবাবিবাহ আইনরূপে স্বীকৃত হয়। ১৮৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা শহরে।
- ১৮৫৭ সাল থেকে নারীশিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫৮ সালের মে মাস পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে নদীয়া, মেদিনীপুর, হুগলী ইত্যাদি জেলায় মোট ৩৫-টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন তিনি।
- ১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাসে পুনরায় অধিকর্তাদের সঙ্গে মতবিরধের কারণে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন।
- ১৮৬১ সালে ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলের দায়িত্ব নেন। এখানে ভাবী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো।
- ১৮৭১ সালে বহুবিবাহ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। বহুবিবাহ সংক্রান্ত বিদ্যাসাগরের প্রথম বইটি এই বছরে, এবং দ্বিতীয় বইটি ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয়।
- ১৮৭৩ সালে মেট্রোপলিটন কলেজ স্থাপন করেন।
- বিদ্যাসাগরের শেষজীবনের একটি বড়ো অংশ কেটেছিল কার্মাটাঁড়ে।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলেছিলেন, 'বাঙ্গালা গদ্যভাষার প্রথম শিল্পী'। অর্থাৎ যদিও বাংলাগদ্যের পথচলা বিদ্যাসাগরের আগেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে যথেষ্ট সৌন্দর্য বা সুষমার বোধ ছিল না। গদ্যের যে ধরনের প্রসাদগুণ সাহিত্যকে রসময় করে তোলে, সেই চিন্তন এবং বোধেরও অভাব ছিল। বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যের সেই অভাবকে প্রথম পূরণ করে। যদিও, রামমোহনের মতো তিনিও, নিছক সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যেই কলম ধরেননি। মূলত ছাত্রপাঠ্য বইপত্রের অভাব মেটানোর জন্য, এবং পরবর্তীকালে সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যে তিনি গদ্যচর্চা শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেই কেজো গদ্যের মধ্যেই বাংলাভাষার অসীম সম্ভাবনা লুক্কায়িত ছিল। বিশেষত বাংলা গদ্যছন্দের চালটি কেমন হবে, বা কোথায় ব্যবহার করতে হবে যতিচিহ্ন, তা বিদ্যাসাগরই প্রথম আবিষ্কার করেন। আমরা পরবর্তী আলোচনায় বিদ্যাসাগরের সেই গদ্যের বিশেষত্বগুলি নিয়ে আলোকপাত করবো, কিন্তু তার আগে বিদ্যাসাগরের লেখা বইপত্রের তালিকাতে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

বিদ্যাসাগরের বইপত্রের তালিকা

১। ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ: বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪৯), জীবনচরিত, বোধোদয় (১৮৫১), বর্ণপরিচয় (১৮৫৪), কথামালা, আখ্যানমঞ্জুরী (তিনটি পর্বে) ইত্যাদি। এই বইগুলির মধ্যে বর্ণপরিচয় এবং আখ্যানমঞ্জুরী বাদ দিলে সবই কোনো না কোনো ইংরেজি বইয়ের ছায়া অবলম্বনে রচিত।

২। অনুবাদমূলক:

ক) ইংরেজি অনুবাদ - ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯)

খ) সংস্কৃত অনুবাদ – মহাভারত আদিপর্ব (১৮৬০), শকুন্তলা (১৮৫৪), সীতার বনবাস (১৮৬০)

গ) হিন্দুস্থানি অনুবাদ – বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭)

৩। সামাজিক বিতর্কমূলক রচনা:

ক) স্বনামে – বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (দুটি প্রস্তাব ছিল, দুটিই ১৮৫৫-তে প্রকাশিত হয়), বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (এখানেও দুটি বই ছিল, প্রথমটি ১৮৭১ এবং দ্বিতীয়টি ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয়)।

খ) বেনামে – অতি অল্প হইল, আবার অতি অল্প হইল, ব্রজবিলাস, রত্নপরীক্ষা ইত্যাদি।

৪। গবেষণাধর্মী রচনা: সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫১)

৫। আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা: আত্মচরিত (১৮৯১), প্রভাবতী সম্ভাষণ (১৮৯২)

বিদ্যাসাগরের গদ্যের বৈশিষ্ট্য

১। বিদ্যাসাগর প্রথম বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট চাল বা তাল ধরতে পেরেছিলেন। পদ্যের মতো গদ্যেরও একটি নিজস্ব ছন্দ, অর্থাৎ তাল আছে। সাধারণত একটি বাক্য গড়ে ওঠে বেশ কয়েকটি বাক্যাংশ নিয়ে। মোটামুটি একটি অর্থবোধ না থাকলে, তাকে বাক্যাংশ বলা যায় না। যাইহোক, গদ্যবাক্যে এই বাক্যাংশগুলির যেখানে অর্থসমাপ্তি হয়, সেইখানে শ্বাসবায়ু মন্দীভূত হয়ে আসে। অর্থাৎ আমরা পড়ার সময় ঈষৎ থেমে গিয়ে নতুন করে শ্বাস নিই। একে যতিপাত বলে। যতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ

এর উপরই গদ্যছন্দের তাল নির্ভর করে। প্রত্যেক ভাষায় গদ্যছন্দ এবং যতির রূপ আলাদা। বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার এই যতির রূপকে আবিষ্কার করেছিলেন।

এবং এই প্রসঙ্গে আরও যা উল্লেখ্য, বাংলাভাষায় যতিচিহ্নের ব্যবহারেও বিদ্যাসাগরই প্রথম বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের আগে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সূত্রে বাংলাভাষায় যতিচিহ্নের একটি ব্যবহারিক কাঠামো তৈরি হয়েছিল, কিন্তু যতিচিহ্নগুলিকে ঠিক কোথায় ব্যবহার করতে হবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল। বিদ্যাসাগর এসে বাংলা গদ্যছন্দ অনুসারে যতিচিহ্নের ব্যবহার শুরু করলেন। অর্থাৎ, তিনি যতিচহ্নের মাধ্যমে দেখিয়ে দিলেন ঠিক কোথায় কোথায় গদ্যছন্দের যতি পড়ে, এবং পাঠককে পড়ার সময় ঠিক কোথায় থামতে হবে। যেমন, 'শকুন্তলা' থেকে নিম্নলিখিত উদাহরণটি যদি আমরা দেখি, তাহলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে,

'কিয়ৎ ক্ষণে রথ মৃগের সন্নিহিত হইলে, রাজা শরনিক্ষেপের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে, দূর হইতে, দুই তপস্বী উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না, বধ করিবেন না।... রাজা, তপস্বীর উল্লেখশ্রবণমাত্র, অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া, সারথিকে কহিলেন, ত্বরায় রশ্মি সংযত করিয়া রথের বেগসংবরণ কর।'

এখানে খুব পরিষ্কারভাবে যতিচিহ্নের ব্যবহার করে গদ্যছন্দের চলনটি বিদ্যাসাগর দেখিয়ে দিয়েছেন।

২। বিদ্যাসাগরের পূর্বে বাংলা গদ্যে দীর্ঘ যৌগিক বাক্য রচনা করার রীতি প্রচলিত ছিল। এই যৌগিক বাক্যগুলি অনেকগুলি বাক্যের সমষ্টি ছিল। তাদেরকে আলাদা আলাদা করে না লিখে একের পর এক সংযোজক অব্যয় দিয়ে জুড়ে দেওয়া হত। এতে বাক্যগঠনে অহেতুক জটিলতা তৈরি হত, এবং পাঠকও পড়ার সময় স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতেন না। রামমোহন এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের লেখায় এই ধরনের যৌগিক বাক্যের ভূরি ভূরি উদাহরণ মেলে। বিদ্যাসাগর এই রীতিকে পরিত্যাগ করলেন। তাঁর লেখায় যে কারণে সংযোজক অব্যয় দ্বারা সূত্রবদ্ধ, ভারসাম্যহীন যৌগিক বাক্যের নমুনা প্রায় নেই।

যেমন – 'সখি তুমি আমাকে বিষ আনিয়া দাও খাইয়া প্রাণত্যাগ করি। তাহা হইলেই সকল আপদ ঘুচিয়া যায়। এই বলিয়া জয়শ্রী শিরে করাঘাত করিতে লাগিল।'

চাইলেই সংযোজক বাক্য দিয়ে এখানে দীর্ঘ একটি বাক্য রচনা করা যেতো, কিন্তু বিদ্যাসাগর তা করেননি। এই সরল এবং ক্ষুদ্র বাক্যের প্রতি ঝোঁক বিদ্যাসাগরের গদ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৩। বাংলা সাধুগদ্যের মধ্যে তৎসম শব্দের আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগরের প্রথম দিককার রচনা এই দোষ থেকে মুক্ত নয়। সুকুমার সেন দেখিয়েছেন বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'-র অনুবাদে বেশকিছু অপরিচিত তৎসম শব্দ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন – আস্যদেশ, প্রাড়িবাক, পুংশ্চলী, তন্ত্রবাপ, ডিণ্ডিম, কাদাচিৎক, নিকাম ইত্যাদি। কিন্তু পরবর্তীকালে এই প্রবণতা বিদ্যাসাগর কাটিয়ে ওঠেন। তাঁর শেষের দিকের রচনায় সহজ তৎসম শব্দ, তদ্ভব ক্রিয়াপদ ও ইডিয়মের সম্মিলনে বিশেষ শব্দকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত বিদ্যাসাগরের তুলনায় সহজ গদ্য তাঁর সমকালে তো বটেই, পরবর্তীকালেও তেমন কেউ লিখে উঠতে পারেননি।

৪। লেখার মধ্যে যুক্তি এবং আবেগের সম্মিলিত ব্যবহার বিদ্যাসাগরের গদ্যের বিশিষ্টতা। সাধারণত, বিতর্কমূলক প্রবন্ধ লেখার যে ধারা তাতে যুক্তির তুলনায় আবেগের স্থান অল্প। কারণ, অতিরিক্ত আবেগ এইধরনের লেখার জমিকে তরল করে দিতে পারে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের লেখায় আবেগ একটি জরুরি বিষয়। তাঁর অনুভূতিশীল মন এবং নিষ্করুণ হৃদয়ের পরিচয় এই আবেগের মধ্যেই লুক্কায়িত আছে।

৫। বিদ্যাসাগরের লেখালেখির একটি বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে অনুবাদ। ভ্রান্তিবিলাস, সীতার বনবাস, শকুন্তলা ইত্যাদি রচনা এবং তাঁর পাঠ্যবইগুলির মধ্যেও বেশকিছু (জীবনচরিত, কথামালা, বোধোদয় ইত্যাদি) এই তালিকায় পড়ে। কিন্তু বিদ্যাসাগর আক্ষরিক অনুবাদক ছিলেন না। তিনি

মূল কাহিনিগুলিকে অনুবাদের সময় বাংলাভাষী পাঠকের উপযোগী করে পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। চরিত্রের নামকরণ, সংলাপ, বাক্যব্যবহার ইত্যাদির মধ্যে বাঙালি সমাজের বিশেষত্ব ধরা পড়ে। যেমন, 'শকুন্তলা'-য় একজায়গায় দেখা যায় গৌতমীকে শকুন্তলা বলছেন,

'হাঁ পিসি! আজ বড়ো অসুখ হয়েছিল; এখন অনেক ভালো আছি।'

এই বাক্যের পিসি সম্বোধন বাঙালি পাঠকের কথা মাথায় রেখে লেখা, কারণ সংস্কৃত ভাষায় পিসি শব্দের প্রচলন নেই। তাছাড়া, বিদ্যাসাগর কাহিনিগুলির পরিবর্তনও ঘটিয়েছেন কিছুক্ষেত্রে। যেমন 'সীতার বনবাস'-এ সীতার পাতালপ্রবেশের ঘটনাটিকে বিদ্যাসাগর অগ্রাহ্য করেছেন এবং সীতার স্বাভাবিক মৃত্যু দেখিয়েছেন।

৬। বিদ্যাসাগরের বেনামী রচনাগুলি (অতি অল্প হইল, রত্নপরীক্ষা ইত্যাদি), স্মৃতিকথা (প্রভাবতী সম্ভাষণ), এবং আত্মচরিতমূলক রচনাগুলি আবার ভিন্ন ধারার গদ্যশৈলীকে বহন করে। বেনামী রচনাগুলিতে বিদ্যাসাগরের শ্লেষপ্রবণতা এবং ব্যাঙ্গাত্মক ভাষ্য তীক্ষ্ণতা লাভ করেছে। অন্যদিকে প্রভাবতী সম্ভাষণ আদ্যন্ত করুণ রসে জারিত। আবার আত্মচরিতের মধ্যে সাবলীল ঋজু গদ্য প্রাধান্য পেয়েছে। বস্তুত বিদ্যাসাগরের আগে এতো বিচিত্র ঘরানার এবং এতো বহুমাত্রিক গদ্যকৌশল কেউই আয়ত্ত্ব করতে পারেননি।